

অন্দৰমহল

শঙ্কৰলাল ভট্টাচাৰ্য্যৰ গল্প

ৰাজা মোহন সিং ভাৰি অদ্ভুত ঢঙে ৰাজ্য চালান। ওৱ বক্তব্য, কাউকে বিশ্বাস কোৱো না। চৰেৰ পিছনে চৰ লাগাও। গোটা ৰাজ্যেৰ সমস্ত খবৰ উনি আট ৰকম বিবৃতিতে পান। একটা দিয়ে উনি অন্যটা বিচাৰ কৰে দেখেন। উপৰন্তু আজকাল উনি একটা নতুন কাজও কৰেন। গলস্টন সাহেবকে দিয়ে উনি যে একটা বিলেতি বই অনুবাদ কৰিয়েছেন সেটা দিনে ঘণ্টাখানেক পড়েন। বইটা মাকিয়াভেলিৰ প্ৰিন্স। থেকে থেকে পড়ার সময় মোহন সিং বলে বসেন, বহুত আচ্ছা!

ইদানীং ৰাজ্যে তাই টু শব্দটিও কাৰোৰ থেকে শোনা যায় না। কিন্তু মোহন সিং একটা নতুন ব্যাপাৰে বড় ভাবিত হয়ে পড়েছেন। প্ৰাসাদেৰ চৰ ভাৰবু খবৰ দিয়েছে ৰানি সুখীন্দৰেৰ কাছে ৰাতে দেখা কৰতে আসে সেনাপতি ভীমসিংয়েৰ ছেলে সুন্দৰ। দালান পাঁচিল টপকে ৰানিৰ ঘৰে ঢুকে থিল মেৰে বসে থাকে বহুক্ষণ। তাৰপৰ ভোৱেৰ আগে-ভাগে পালায়। সুন্দৰ কীভাবে না কীভাবে জানতে পাৰে কোন কোন দিন ৰাজা যাবেন না ৰানিৰ কোঠায়। এই জানা অবধি মোহন সিংয়েৰ ঘুম চলে গেছে। যদি কাউকে জীৱনে তিনি বিশ্বাস কৰে থাকেন তবে তা ৰানি সুখীন্দৰকে। বয়সে ৰাজাৰ চেয়ে অন্তত বিশ বছৰেৰ ছোটো হলেও সুখীন্দৰেৰ বুদ্ধি খুব পাকা। যেদিন বিয়ে কৰে

এনেছিলেন সেদিন আগের রানির আত্মীয়েরাও স্বীকার করেছিলেন, না, রাজা কাজটা ভালোই করেছেন।

সুখীন্দর কিন্তু মাঝেমধ্যেই রাজাকে বলেন, আপনার এত সন্দেহ বাতিক কেন? রাজ্যে যা হবার হবে। তাতে দিনরাত অতশত গুপ্তচর লাগিয়ে কী হবে?

রাজা তখন হাসেন। বলেন, এক তোমাকে ছাড়া আমার আর কারোকেই তো বিশ্বাস করা ঠিক না। চার-চারটে ঝি রেখেছি বলেই না বড়োরানি তোমাকে বিষ খাইয়ে মারতে পারছে না। এই প্রত্যেকটা ঝি প্রত্যেকটা ঝিয়ের খবর এনে দেয় দেওয়ান সাহেবকে। সেটা জান কী?

এখন সেই সুখীন্দরই চুপিসাড়ে প্রেম করছেন সুন্দর সিং-এর সঙ্গে। রাজা রাগে হাত কামড়াচ্ছেন। উনি ডেকে পাঠিয়েছেন কালু খাঁকে সুন্দরকে ধরার ব্যবস্থা করতে। কালু এক

সময় মোহন সিংয়ের বাবা দরবার সিংয়ের বডিগার্ড ছিল। নৃশংস ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই সারাহিন্দুস্থানে। ওরই ছেলে এখন হিন্দুস্থানের বাদশাহ বাহাদুর শাহের সেনাদলে ভরতি। এক এক গুলিতে দু-দুটো লোক জখম করতে পারে।

কালু এসে একটা চমৎকার সমাধান দিল। বলল ইঁদুর ধরার মতো ফাঁদ পেতে সুন্দরকে পাকড়াও করা হোক। পরদিন শহরের লোকের সামনে ওর ফাঁদের দড়িটা দু-দুটো ষাঁড়ের গলায় বেঁধে ষাঁড় দুটোকে বিপরীত দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। এভাবে বড়ো জোর পনেরো মিনিটে সুন্দর সিংয়ের দেহটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে! ওই দেখে শহরের আর যারা অন্যের বউদের সঙ্গে ফস্টিনাষ্টি করে তারা তাদের ভবিষ্যৎটা বুঝে যাবে। মতলব শুনে মোহন সিং যার পর নাই খুশি হয়েছেন। এই ক-দিনে সুখীন্দরের উপর

ভালোবাসাটা তীব্রভাবে বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে গেছে সুন্দরের ওপর রাগ এবং ঘৃণা। প্রতিহিংসার জেদটা এখন টগবগ করে ফুটেছে রাজার অন্তরে।

ঠিক হল রানির কোঠায় যাবার জন্য সুন্দর যেদিকটা দিয়ে পাঁচিল উপকায় সেখানে একটা মোটা দড়ির জাল পাতা হবে। দেওয়াল বেয়ে সুন্দর যখন উঠবে, ওর নিজের হাতের টানেই একসময় দড়ির জাল ওর গায়ে নেমে আসবে। সকাল বেলায় ওই অবস্থাতেই ওকে রানির কোঠার সামনে ঝাঁড়ে টানানো হবে। যেহেতু আর কেউ জানে না কেন সুন্দরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ওকে জালে বাঁধা অবস্থাতে দেখলে লোকে জানবে হারামজাদা নিশ্চয়ই কোনো কুকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এবং রানি সুখীন্দরকেও রাজা জানতে দিতে চান না যে, তিনি ওদের ব্যাপারটা পুরো জানতেন, তাই ওর জানলার সামনে সুন্দরকে মারা হলে রানি নিজেও ভবিষ্যতে ওরকম প্রেমটেম আর করবেন না। গলস্টন সাহেবই একসময় রাজাকে বুঝিয়েছিলেন যে, খোদ শাস্তির চেয়ে শাস্তির ভয়টাই মেয়েদের বেশি। ব্যাখ্যাটা রাজার খুব মনে ধরেছিল।

সুখীন্দর ওঁর জানালা দিয়ে প্রেমিকের আসার পথটা দেখছিলেন। একফালি চাঁদ তখন আকাশে। সুখীন্দরের কোঠায় কোথাও একটা বাতি জ্বলেনি। গত সাত দিন ধরে সুন্দর ক্রমাগত কবিতা শুনিয়েছে ওকে। সুন্দর কবিতা খুব একটা ভালো বলতে পারে না, কিন্তু অজস্র ভাব আছে গলায়। প্রদীপের আলোয় ও যখন কবিতা পড়ে তখন সুখীন্দর এক মনে ওর মুখটা দেখেন। সুন্দরের ঠোঁটটা সাধারণ পুরুষের তুলনায় সরু, কিন্তু ওর চোখগুলো গভীর। ও কখনও শরাব পান করে না। কবিতা পড়ার সময় ওর চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলে ওঠে জায়গায় জায়গায়। গত তিন দিন ধরে ও সুখীন্দরকে চুমু খেতে চাইছে। সুখীন্দর হয়তো আজ ওকে সেই অনুমতি দেবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেবেন কী?

সুখীন্দরের বোধ হয় একটা তন্দ্রার মতন এসেছিল। আচমকা ঘোর ভাঙতে দেখলেন সুন্দর একটা মস্ত জালের মধ্যে লটকে গিয়ে আপ্রাণ পালাবার চেষ্টা করছে। আর যতই চেষ্টা করছে। ততই যেন কে বা কারা আরও জোর দিয়ে টেনে টেনে জালটা বসিয়ে দিচ্ছে ওর শরীরে। সুন্দর কয়েকবার সুখীন্দরের নাম ধরে ডাকল, কিন্তু সুখীন্দর সাড়া দিতে গিয়ে চুপ করে গেল। কী সর্বনাশ! কেউ যদি শুনে ফেলে? স্বয়ং রাজাই যদি শোনেন? সুখীন্দর আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে পালঙ্কের ওপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বার বার মনে পড়তে লাগল সুন্দরের সরু ঠোঁট আর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো।

সকালে ঘুম ভাঙল যখন সুখীন্দরের তখন দুটো প্রকান্ড ষাঁড় সুন্দরকে টেনে-হেঁচড়ে টুকরো টুকরো করছে। সমস্ত চত্বরটা রক্তে ধুয়ে যাচ্ছে। সুন্দরের প্রাণপাখি অনেক আগেই পালিয়ে গেছে, কিন্তু ষাঁড় দুটো তখনও নিজেদের বল পরখ করে যাচ্ছে। শহরের লোকগুলো যে এত নির্ভুর সুখীন্দর আগে জানতেন না। অন্তত দু-আড়াই হাজার লোক বিস্ফোরিত নেত্রে এই মরণ খেলা উপভোগ করছে। একটিবার ওই দৃশ্য দেখেই সুখীন্দরের মনে হল উনি আর বাঁচবেন না।

খানিক পরে গোটা প্রাসাদ জেনে গেল রানির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর আর কিছুই মনে পড়ে না। স্বয়ং রাজাকেই তিনি আর চিনে উঠতে পারছেন না। রাগে, অনুশোচনায় কঠিন মনের মানুষ মোহন সিংয়ের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুর জন্যই নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে। তিনি রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠাবার জন্য হুকুম দিলেন। রানির দাসীদের সবাইকে ওঁর ওপর ভালো নজর রাখতে বললেন। মাথা খারাপ হলে মানুষ কত কীই না করে বসে! সেদিন আর মোহন সিং ম্যাকিয়াভেলি পড়লেন না। সভার গাইয়েদের বললেন খুব করুণ করে সন্ত কবিরের দোঁহা গাইতে। ছোটবেলায়

মোহন সিংয়ের মা খুব কবিরের দোঁহা গাইতেন। আজ ফের নিজেকে ভারি উজবুক, ভারি ছেলেমানুষ মনে হতে লাগল রাজার।

রাজবৈদ্য রানিকে পরীক্ষা করে বুঝলেন ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যদি ফের কাউকে রানির ভালোবাসা পেতে হয় তাহলে বেশ কল করতে হবে। ঠিক যে দৃশ্য থেকে রানির মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে সেখান থেকেই ফের পুরো ব্যাপারটা সাজিয়ে তুলতে হবে। বৈদ্য রাজাকে ডেকে এক অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন। বললেন, শোনা যায় রানিমার একটু দুর্বলতা ছিল সুন্দর সিংয়ের জন্য। আপনাকে এখন থেকে ওর কাছে সুন্দর সিং সেজে

যাতায়াত করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখছি না। এ রোগ তো ওষুধে যাবার নয়।

রাজা প্রথম প্রথম কথাটা শুনে থ মেরে গেলেন। তারপর অনেকক্ষণ ভাবলেন। অবশেষে ভাবতে ভাবতেই বললেন আচ্ছা দেখি।

গোঁফে ঝুলপিতে ছোঁয়া ছোঁয়া কলপ দিতে দিতে মোহন সিং নিজের মনেই হেসে ফেললেন। বিলিতি মেক-আপ ম্যান এসে সুন্দর সিংয়ের ছবি দেখে দেখে রাজাকে সুন্দর বানাচ্ছে দেখলে রানি সুখীন্দরও হাসি চাপতে পারবেন না। শেষে রাজা যখন সুন্দরের মতন পাগড়ি আর নাগরাই পরলেন মেক-আপ ম্যান রবার্টস ওয়ানডারফুল! ওয়ানডারফুল! বলে গলা ফাটিয়ে চঁচিয়ে উঠল। রাজাকে খুশি করার জন্য বলল, নাউ ইউ আর জাসট সুন্দর সিং। ইভন হিজ ড্যাডি উইল কল ইউ সন। রাজা খুশিই হলেন, ইংরেজিতে তারিফ শুনে। চট করে একটা মোহর বার করে রবার্টসকে দিলেন।

রাত্রে যখন মোহন সিং পাঁচিল দালান ডিঙিয়ে রানির কোঠায় যাচ্ছিলেন তখন ওঁর কেন জানি না মনে হল, এই জীবনটাই আসলে সুখের। যত রাজ্যের জাল মানুষ দিয়ে রাজ্য চালানোয় সত্যিই কোনো সুখ নেই। বরং বড়োরানির ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে বাকি জীবনটা সুন্দর সেজে সুখীন্দরের সঙ্গে প্রেম করলে মন্দ হয় না। আবেগের বশে মোহন সিং গুনগুন করে পুরোনো প্রেমের কাওয়ালি গাইতে লাগলেন। আর ঠিক তখনই কী ভেবে উনি ওপরে চাইতে দেখলেন একটা মস্ত দড়ির জাল সড়সড় করে নেমে আসছে ওঁর শরীরের দিকে। তখন উনি এক হাতে একটা কার্নিশ চেপে ধরে আছেন। হাত ফসকালেই চল্লিশ ফুট নীচে বাগানের শিকের ওপর পড়বেন। ভয়ে চিৎকার করবেন, তারও উপায় নেই। লোকজন উঠে এসে ওঁকে এই অবস্থায় দেখলে কী বিশ্রী ব্যাপারই না হবে। রাজা চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। ওপরে জানালায় দাঁড়ানো রানি সুখীন্দর স্মিত হেসে ইশারায় রাজবৈদ্যকে ফাঁস শক্ত করতে নির্দেশ দিলেন।

সম্ভবত মিনিট দশেক ধস্তাধস্তি করে রাজা জালের মধ্যে অচেতন্য হয়ে পড়লেন। বৈদ্য কাজ হাসিল করে রানির ঘরে গিয়ে বকশিশ নিলেন। সুন্দরের মৃত্যুর শোধ উঠেছে দেখে রানি খুশি হয়ে একটা জড়োয়ার সেট তুলে দিলেন বৈদ্যের হাতে। বৈদ্য বললেন, আপনি পাগলের অভিনয় ভালোই করেছিলেন। না-হলে রাজাকে এই বোকা বানিয়ে মারা কি সম্ভব ছিল?

দেখুন, আমরা বৈদ্যরা পয়সা পেলেই তোক মারতে পারি। তবে এভাবে জাল ফেলে কাউকে মারিনি। রাজ পরিবারের লোকদের বিষ খাইয়ে মারা তো আমাদের উপরি আয়ের একটা বড়ো রাস্তা। সেরকম টাকা পেলে আমরা পুরো গ্রামকে গ্রাম বিষ খাইয়ে মারতে পারি। লোকে ভাববে মহামারি হয়েছে। হেঁ হেঁ হেঁ!

বৈদ্যকে বিদায় করে রানি ঔঁর প্রিয় পরিচারিকা বিহারী মেয়ে মতিয়াকে ডাকলেন। মতিয়া ঘরে ঢুকতেই জিপ্তেস করলেন, তোর রানি হতে ইচ্ছে করে? মতিয়া বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল। রানি হওয়া? সে আবার কী কথা? রানি হতে কার না ইচ্ছে করে? কিন্তু করছে কে? মতিয়া লাজুক মেয়েটির মতোই ঘোমটা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রানি কাছে এসে ওর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, আমি সত্যিই তোকে রানি করে দেব। তুই রানি থাকবি, পাগলি রানি। কোনোদিন এই অন্দরমহল থেকে বেরোবি না। সবাই তোকে কুর্নিশ করবে। তোর গুপ্ত প্রেমিক দলবীরকে মাঝ রাতে তোর ঘরে ঢুকিয়ে আনবি। কিন্তু খবরদার! কেউ যেন টের না পায়। তাহলেই বড়োরানির ছেলে, যে ক-দিনের মধ্যেই রাজা হবে সে তোকে কোতল করবে। তুই কেবল হীরে জহরত পরে দিনের বেলা পাগলি সেজে ঘরের মধ্যে ঘুরবি। চারটে দাসী থাকবে, কারোকে তোর মুখ দেখতে দিবি না। বাকি জীবন তোর সুখে কাটবে। বল, রাজি তো?

মতিয়া ফের ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে না বলল। রানি দপ করে জ্বলে উঠে বললেন, তাহলে কালই আমি দলবীরকে রাজার খুনি বলে ধরিয়ে দেব। তখন বুঝবি তোর প্রেমের কী দশা হয়।

রাজার খুনি! মতিয়া কিছুই বুঝল না তখন। রানি ওকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পেছনের দালানের জানালায় নিয়ে জালে ফাঁস-বাধা মোহন সিংয়ের দেহটা দেখালেন। লম্বা দড়ির জালে ঝুলছেন মোহন সিংহ তিন তলা সমান উঁচুতে। মুখে ছোপ ছোপ রক্ত। ভয়ে মুখ চাপা দিল মতিয়া। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল, না না রানি মা। দলবীরকে খুনি সাজিয়ে না। আমি রানি হব। আমি রানি হব। আমি পাগলি সাজব!

রানি ফের নিজের শোবার ঘরে গিয়ে সমস্ত সিন্দূকের চাবি তুলে দিলেন মতিয়ার হাতে। কানে ফিস ফিস করে বললেন; ভগবান তোর মঙ্গল করুন মতিয়া। তারপর নিজের কাপড় ছেড়ে মতিয়ার কাপড় পরে রানি রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। প্রাসাদের দ্বাররক্ষী রানিকে মতিয়া ভেবে অন্ধকারে জাপটে ধরল। গালে গাল ঘষতে লাগল, মুখে চুমু দিতে লাগল। ওর দেহের বিশ্রী গন্ধে রানির প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছিল। কিন্তু পালাতে হলে ওটুকু সহ্য করতেই হবে জেনে রানি মুখ বুজে রইলেন। কারণ তখন ভোর হয় হয়। রাজার ব্যাপারটা জানাজানি হলেই কেলঙ্কারি। সাতদিন সমানে হেঁটে সারিন্দ রাজ্যে গিয়ে প্রথম বিশ্রাম নিলেন রানি সুখীন্দর। একটা হিরের আংটি বিক্রি করে দুটো বাঁদর, একগাছা দড়ি আর একটা ডুগডুগি কিনলেন। তারপর বাকি টাকা দিয়ে গোরখ মহল্লায় একটা ঘর ভাড়া করতে গিয়ে খবর পেলেন রাজা মোহন সিং এবং তাঁর রানিকে খুন করার দায়ে রাজপ্রাসাদের এক পরিচারিকা এবং পুরুষ কর্মচারীকে খোলা রাস্তায় কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। খবরটা শুনতেই একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল সুখীন্দরের শরীরে। ওর আর ঘর ভাড়া করা হল না। বাঁদরগুলোকে নিয়ে সরাসরি নদীর ধারে চলে গেলেন। জন্তুগুলোকে কিছু দানা ছড়িয়ে দিয়ে উদাসভাবে চেয়ে রইলেন নদীর নীল জলের ওপারে আধ-ডোবা সূর্যের দিকে। ওঁর মনে হল ওঁর হৃৎপিণ্ডটাই যেন আস্তে আস্তে জলে ডুবে যাচ্ছে। এবং খানিক বাদে সত্যিসত্যিই পাগল হয়ে গেলেন।